বাংলাদেশ
লোক ও কারুশিল্প
ফাউন্ডেশন

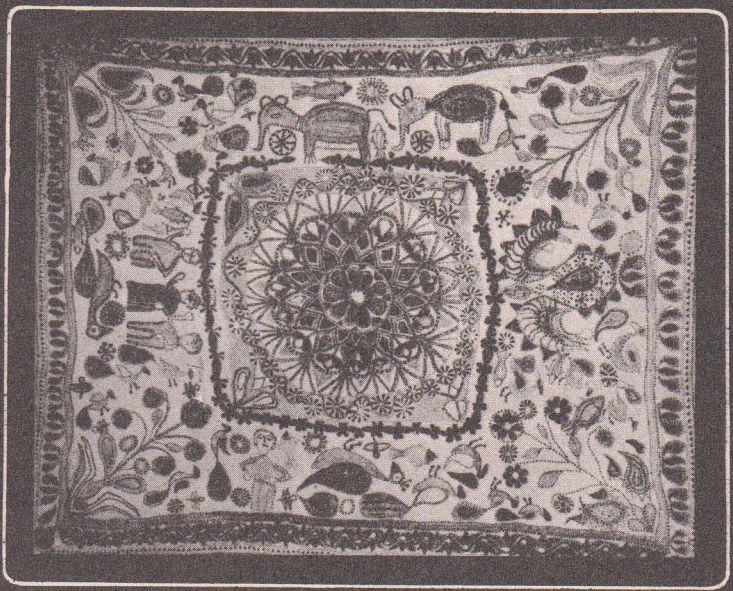

সোনারগাঁ, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

সোনারগাঁ, ঢাকা

ঃ মুখবন্ধ ঃ

উনিশ'শ একাত্তর সালে মুক্তি যুদ্ধের পর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক সত্য হিসেবে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিজ মর্যাদায় বেঁচে থাকার অধিকার পায়। বাংলাদেশ সৃষ্টির ফলে আমাদের এই ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের সামাজিক দিগ-বলয়ে ঐ ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ কল্পে, ঐতিহ্য অনুসন্ধান একটি প্রধান কর্ম হিসেবেই দেখা দেয়।

বাংলাদেশী সংস্কৃতির বিশেষতঃ লোকশিল্পকলার উদ্ভব, বিকাশ এবং বিলুপ্ত ও প্রায় বিলুপ্ত লোকজ উপকরণের ব্যবহার—আঙ্গিক অলং-করণসহ টিকিয়ে রাখার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন' নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সাধারণের মধ্যে লোকজ শিল্পকলার ভূমিকা, বর্তমান প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য এবং লোকজ শিল্পকলার উৎস পর্ব বিষয়ে গত ১৮ই জুন '৭৯ তারিখে এক সেমিনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল, দেশের খ্যাতনামা ভাষাবিদ্ ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের। দুঃখের বিষয় অসুস্থতাজনিত কারণে ঐ দিন তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

সেমিনারে ফাউণ্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে, সহ পরিচালক সৈয়দ মাহবুব আলম এবং লোক শিল্পে অস্ত্রাল সংস্কৃতির ভূমিকা বিষয়ে গবেষণা অফিসার সাইফুদ্দীন চৌধুরী প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ দুটো উপস্থিত সুধীমণ্ডলী কর্তৃক প্রশংসিত হয়।

সেমিনারের এই সংক্ষিপ্ত কার্য বিবরণীতে প্রবন্ধ দুটো প্রকাশ করা হ'ল। রচনার বর্ণিত বিষয়, লোক শিল্পকলা এবং বর্তমান প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যদি কোন ধারণা দিতে পারে—তবে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

সফিকুল আমীন
নির্বাহী পরিচালক,
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন
সোনারগাঁ, ঢাকা

লোকশিল্প যাদুঘর ও শিল্পগ্রাম—'ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ'

—সৈয়দ মাহবুব আলম

বাংলাদেশের সংস্কৃতির বুনিয়াদ পল্লীজীবন ভিত্তিক লৌকিক আচার আচরণ, উৎসব ও লোকজ শিল্পকলার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

এই লোক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে আবহমান বাংলার লোক সমাজ। মূলতঃ পল্লীর জনসাধারণকে নিয়েই গঠিত হয়েছে আমাদের লোক সমাজ। এই লোক সমাজ বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারক।

এই লোক সমাজের জীবন-ধারণ রীতি থেকে শুরু করে শস্য ফলনের রীতি, পানাহার, খেলাধূলা, লৌকিক উৎসব, কাব্য, সাহিত্য, অভিনয়, নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, কুটিরশিল্প, পোশাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, মাটির হাঁড়িকুড়ি, পোড়ামাটির ফলক, পুতুল, নকশীকাঁথা ও পাখা, পাটি, পট-পাটা, সরা, দেয়ালচিত্র, শোলার কাজ, পিতল কাঁসার কাজ, তারভরণের কাজ, বাদ্যযন্ত্র এ সবই লোকচারু ও কারুশিল্প যা আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পদ।

এ সব লোকচারু ও কারুশিল্পের শিল্পী ও কারিগর গ্রামবাংলার নিরক্ষর সাধারণ মানুষ। কেবল শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা থেকে এসব লোকচারু ও কারুশিল্পের সৃষ্টি হয়নি, বরং প্রাত্যহিক জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে কাজ করতে গিয়ে বা কাজের অবসরে গ্রামের সাধারণ মানুষ এসব লোকশিল্প সৃষ্টি করেছে। আপনা থেকেই এসব লোক চারু ও কারুশিল্পে রূপ ও রসের আবির্ভাব ঘটেছে। রূপ ও রসপূর্ণ এই লোকশিল্পই আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আজকের বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বা নির্মাণের মূল চালিকা শক্তি।

শিল্পায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধনের ফলে সারা বিশ্বে এর প্রভাব পড়েছে। নগরায়ন হয়েছে দ্রুত। নগরকেন্দ্রিক

সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ক্রমশ বিলুপ্ত হোতে চলেছে বিশ্বের লোক সংস্কৃতির ভাণ্ডার। অপেক্ষাকৃত বিলম্বে হলেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়েছে। এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত লোক সংস্কৃতির ভাণ্ডার লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনসমূহ বিলুপ্ত ও বিকৃত হতে চলেছে।

এ অবস্থায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ তার ঐতিহ্যবাহী লোক চারু ও কারুশিল্পকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে রক্ষার জন্য এর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ায়, ১৯৭৫ সালে মরহুম শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় চতুর্দশ শতকের বাংলার রাজধানী এবং মসলিন ও অন্যান্য লোকশিল্পের জন্য বিখ্যাত ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান বাংলাদেশ ও বিশ্বে বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও এর প্রসারের চেষ্টা চালানই হচ্ছে ফাউণ্ডেশনের লক্ষ্য।

লোকজ সংস্কৃতির নিদর্শনসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যেই ফাউণ্ডেশন লোকশিল্প যাদুঘর ও শিল্পগ্রাম—'ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ' প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

ফাউণ্ডেশন লোকশিল্প যাদুঘরে সংগৃহীত লোকচারু ও কারুশিল্পের নিদর্শনসমূহের প্রদর্শনের মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশের জনগণ ও বিশ্বের মানুষকে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্গে সরাসরি পরিচয়ের সুবিধা সৃষ্টি করেছে।

পল্লীজীবন ভিত্তিক বাংলাদেশের লোক সমাজের সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যাবে, যাদুঘরে সংগৃহীত লোকজ সংস্কৃতির নিদর্শনসমূহে। এ ছাড়াও এ সব নিদর্শনসমূহে বাংলাদেশের জনগণের অস্তিত্বের সংগ্রাম ও নন্দনতাত্ত্বিক মনোভাবের পরিচয় মিলবে।

লোকশিল্পের নিদর্শনসমূহে যে রং, রূপ, রস, সৌন্দর্য ও উপযোগিতা অনিবার্যভাবে মূর্ত হয়ে আছে তাও বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজের জন্য সুস্থ, সবল ও আদর্শ শিক্ষার নিদর্শন বলে বিবেচিত হবে।

ফাউণ্ডেশনের কর্মসূচী কেবল যাদুঘরে লোকজ সংস্কৃতির নিদর্শন-সমূহের প্রদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এসব নিদর্শনের ঐতিহ্যগত মূল্য নিরূপণসহ আধুনিকতার নিরীখে এর চিরায়ত উপো-যোগিতার কথা বিবেচনা করে লোকশিল্প গ্রামের ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

লোকশিল্প গ্রামের ওয়ার্কশপগুলোতে লোকজ সাংস্কৃতিক সম্পদ লোকশিল্পের নিদর্শনসমূহের চিরায়ত উৎপাদন ও অলঙ্করণরীতির প্রশিক্ষণ দেয়াও সম্ভব হবে। ফলে কৃষক, শ্রমিক, মজুর, ছাত্র ও মহিলারা এখানে প্রশিক্ষণ লাভ করে দেশের লোকজ সংস্কৃতির ঐতি-হ্যের সঙ্গে হাতে কলমে পরিচিত ও শিক্ষা লাভ করতে পারবে এবং অবসর সময়ে কাজ করে বাড়তি আয়ের পথ সুগম করবে।

প্রকল্পে ফাউণ্ডেশনের মূল লক্ষ্য তিনটি ধারার কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এই তিনটি ধারা হ'লো।

(১) লোকশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য যাদুঘর প্রতিষ্ঠা।
(২) লোকশিল্পের প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠা।
(৩) লোকশিল্পের প্রদর্শন, উৎপাদন ও বিক্রয়।

১। লোকশিল্প যাদুঘর

লোক ও কারুশিল্পের লুপ্তপ্রায় নিদর্শনাদি সংগ্রহ সংরক্ষণ ও এর স্থায়ী, ভ্রাম্যমান, শিক্ষামূলক ও বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, এবং জাতীয় পর্যায়ে লোকশিক্ষা কর্মসূচীর আয়োজন করা।

বাংলাদেশের লোকশিল্প সম্পর্কে নানা তথ্য উদঘাটন এবং বর্তমান বাংলাদেশ ও বিশ্বে বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য গবেষকগণ গবেষণা চালাবেন। এবং এই গবেষণা প্রকাশনার মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরা হবে।

২। প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপ

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দক্ষ অথচ অখ্যাত ও অবহেলিত কারিগরগণ প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের লোকশিল্পের

প্রশিক্ষণ দেবেন। প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল হবে তিন থেকে ছয় মাস। একটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের সংখ্যা হবে কমপক্ষে ২০ জন। বিশেষ করে কৃষিকাজের অবসরে যাতে প্রশিক্ষণ পেতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রশিক্ষণের সময়সূচী নির্ধারণ করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে পরীক্ষামূলকভাবে আট ধরণের লোকশিল্পের প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করা যেতে পারে। এগুলো হচ্ছে ঃ

১। তাঁত (বয়ন, ছাপা, বাটিক ইত্যাদি)।
২। মৃৎশিল্প (কুমার, পটুয়া)।
৩। কাঠ, কাঠখোঁদাই।
৪। বেত, বাঁশ, শোলা।
৫। পাট ও পাটজাত দ্রব্য।
৬। পিতল, কাসা ও রূপা।
৭। ঝিনুক, হাড় ও শাঁখা।
৮। হস্তনির্মিত মোটা ও তুলোট কাগজ।

যাদুঘরে কর্তব্যরত গবেষকদের গবেষণার ভিত্তিতেও ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। বাংলাদেশের লোকশিল্পের নিদর্শনসমূহে যে রং, রূপ, রস, সৌন্দর্য ও ব্যবহারিক উপযোগিতা রয়েছে সে দিকে লক্ষ্য রেখেই ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। বিশেষ করে যে সব অঞ্চল বিশেষ ধরণের লোকশিল্পের জন্য বিখ্যাত সেসব অঞ্চলেও বিশেষ ও অস্থায়ী ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

বর্তমানে দেশে যে ধরণের লোক ও কারুশিল্পের উৎপাদন হচ্ছে তার মধ্যে যথেষ্ট বিদেশীভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে দেশে আমাদের ঐতিহ্য মণ্ডিত লোকশিল্পের নামে নিছক হস্তশিল্প উৎপাদিত হচ্ছে। এই অবস্থাকে রোধ করতে এবং লোকশিল্পের উৎপাদনে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফাউণ্ডেশনের ওয়ার্কশপগুলো প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনের মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

৩। প্রদর্শন, উৎপাদন ও বিক্রয়

প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপে লোক ও কারুশিল্পের প্রশিক্ষণের সাথে সাথে লোক ও কারুশিল্পের উৎপাদনও সম্ভব হবে। লোকশিল্পের যে সব

নিদর্শন এখন আর উৎপাদন সম্ভব হচ্ছেনা বা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তা যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে, এসব পুনরায় উৎপাদন সম্ভব হবে। ওয়ার্কশপে উৎপাদিত লোকশিল্পের সামগ্রী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রি হবে। ওয়ার্কশপে উৎপাদিত সামগ্রী দেশের লোকশিল্পের স্বাভাবিক উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন ও লোকজ শিল্পের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে। এবং লোকশিল্প ও হস্তশিল্পের পার্থক্য নির্ধারণেও এখানে উৎপাদিত লোকশিল্পের সামগ্রী বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। বিদেশে রফতানীযোগ্য লোকশিল্পের সামগ্রীর মান উন্নত করার ব্যাপারে ওয়ার্কশপে উৎপাদিত সামগ্রী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো নানান ধরণের লোকশিল্পের সামগ্রী তৈরী হচ্ছে যা অনেকের কাছেই অজানা রয়ে গেছে তারও নিদর্শন বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রি ও প্রদর্শনের জন্য রাখা হবে।

আপাততঃ প্রায় একশ পঞ্চাশ বিঘা আয়তনের 'ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ' এর কাজ শুরু করা হবে। পরে সংশোধন করে প্রায় চারশ বিঘা আয়তনের করা হবে।

এই 'ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ' এ বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যসূচক গ্রাম এর উপাদান মানুষ, ঘর, গাছপালা, নদী, পুকুর, খালবিল, ক্ষেত-খামার ও রাস্তাঘাট থাকবে।

'ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ' পরিবেশে অঞ্চলভিত্তিক সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলতে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ স্থাপত্যের বৈচিত্র্যময় নিদর্শনসহ অঞ্চলভিত্তিক পল্লী পরিবেশ তুলে ধরা হবে।

এ ছাড়াও এখানে থাকবে উপজাতীয় জীবন যাত্রার পূর্ণাঙ্গ চেহারা।

জাতীয় পর্যায়ের বার্ষিক লোকমেলার আয়োজনের জন্য থাকবে গ্রামীণ পরিবেশযুক্ত একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্পের কারিগর ও শিল্পীরা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আয়োজিত মেলায় অংশগ্রহণ করবে। নিয়মিত অন্যান্য লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও এখানে আয়োজন করা হবে।

'ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ' প্রকল্পের লোকশিল্প গ্রামে দেশের লোক-শিল্পের দক্ষ কারিগররা ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণ কাজ চালিয়ে যাবে। সেই সাথে চলবে গ্রামবাংলার চিরায়ত কর্মপ্রবাহ কৃষিকাজ।

ঐতিহাসিক সোনার গাঁয়ের লোকশিল্প যাদুঘরে সব সময় বিদেশী পর্যটক ও দেশের বহুসংখ্যক দর্শনার্থীর ভীড় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ফলে বিশেষ করে বিদেশী পর্যটকদের কাছে 'ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ' আকর্ষণের বিষয় হবে। এখানে এক নজরে আবহমান বাংলাদেশের রূপ ও তার মানুষের কর্মকাণ্ডের চমৎকারিত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ হবে। সবকিছু মিলিয়ে এখানে বাংলাদেশের চিরায়ত রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে।

বর্তমান বাংলাদেশের জনগণ ও বিশ্বের মানুষ এই 'ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ' এ লোকশিল্প যাদুঘর, লোকশিল্প গ্রাম ও পল্লী পরিবেশ দেখে বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

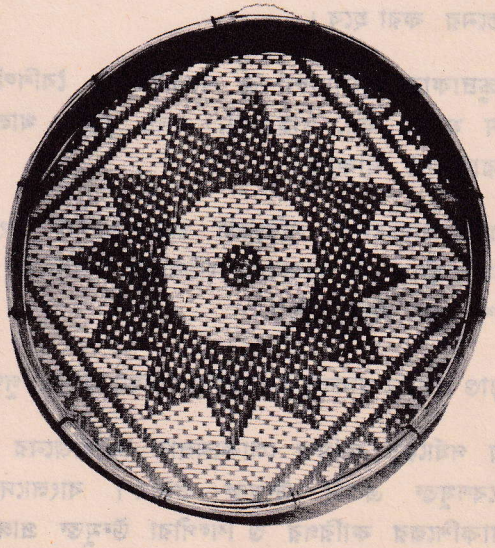

১। বাঁশ ও বেতের কাজ (নকশী ডালা)।

আমাদের লোকশিল্পে আদি-অস্ত্রাল উপকরণ

—সাইফুদ্দীন চৌধুরী

বাংলাদেশে বাঙালীর লৌকিক জীবনে কোন জাতি কতটা আবদান রেখেছে? তার স্বতন্ত্র মূল্যায়ন এখনও হয়নি। পণ্ডিতদের অনেকেই মত পোষণ করেছেন, খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে আর্যদের প্রাচীন ভারতের এই অংশ—বাংলায় আগমনের পর থেকে সমাজ ব্যবস্থায় ধারাবাহিকতা আসে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির জয়যাত্রার পথ এ সময়েই উন্মোচিত হয়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। বাংলার জাতিতাত্ত্বিক আলোচনায়, একথা আজ স্পষ্ট যে, আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির বৃহদাংশ প্রাগার্যকালের ক'টি জাতির ধর্মকর্ম এবং সামাজিক ধ্যানধারণার রূপান্তরিত ধারা মাত্র। আর্যরা একমাত্র উত্তরাধিকার নয়। আর্যপর্বের ভূমিকা অনেকাংশে নগণ্য। লোকায়ত সভ্যতা-সংস্কৃতিতে প্রাগার্য জাতিসমূহের পাশাপাশি আর্যপর্বের স্থান, জবর দখলমূলক স্থান দখলের মত। বলা যায় আজকের বাংলার লৌকিক সংস্কৃতি ও শিল্পকলার প্রধান অংশ প্রাগার্য জাতিসমূহের আচারানুষ্ঠান, কৃষিজীবী জীবন এবং নানা দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

প্রাচীন বাংলায় কখন থেকে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল, সঠিক কাল নিরূপণ জটিল ব্যাপার। প্রত্ন প্রস্তর এবং অন্যান্য যুগ বিভাগের নানা নির্ভরযোগ্য তথ্য থেকে অনুমিত হয় যে, বাংলায় আবশ্যিক কারণেই আদিম মানব সভ্যতার বিবর্তন সাধিত হয়েছিল। পণ্ডিতগণ ওই সভ্যতার অংশীদার হিসেবে আর্যপূর্ব যুগের ক'টি জাতির অবদানের কথা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, প্রাগার্য জাতি হিসেবে পরিচিত আদি—অস্ত্রাল [১] দ্রাবিড় কখনও স্বতন্ত্রভাবে কখনও সম্মিলিত-ভাবে বাংলার বাংগালীর লৌকিক জীবনে প্রভাব ফেলেছে। আদিম সংস্কার প্রসূত লৌকিক ধর্মকর্মের অবিন্যস্ত হৃদয় প্রধান এই ধারা

১। আদি-অস্ত্রাল জাতি ছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী। অস্ট্রিক ভাষার বিস্তৃত ছিল পাঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত।

লৌকিক তন্ত্র মন্ত্রে, লোকায়ত যোগাচারে, বিধিবর্হিভূত ভক্তিবাদে এবং লোকায়ত নানা সংস্কার বিশ্বাস ও শিল্পকলায় অপেক্ষাকৃত অধিক প্রভাব ফেলেছে। আর প্রাগার্য জাতিসমূহের মধ্যে প্রোটো অস্ত্রালয়েড (Proto Aus-traloid) বা অষ্ট্রিকভাষীদের অস্ত্রাল বৈশিষ্ট্যই অবদান রেখেছে বেশী।[২] সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বে দেখা যায় অস্ত্রাল সংস্কৃতিই বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির শিল্পকলার অন্যতম প্রধান উৎস। এ জাতির রক্ত প্রবাহই বাঙালীর রক্তে প্রবল। এদের দেহ খর্বাবার, মাথার খুলি লম্বা এবং মাঝারি ধরণের। নাক চ্যাপটা ও চওড়া, গায়ের রং কাল এবং মাথার চুল ঢেউ খেলান।

নব্য প্রস্তর যুগে এরা বাংলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এবং পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস শুরু করে। এরা অষ্ট্রেলিয় ভাগের অন্তর্গত।[৩] এদের বসবাস এখানেই সীমিত নয়, সিংহল থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তা ছাড়া আফগানিস্তান পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আরব এবং ইন্দোচীনেও এদের বর্তমানতার প্রমাণ আছে।

বাংলা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে এবং সিংহলের ভেড্ডাদের মধ্যে আদি অস্ত্রালদেরই দেহ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ধরা পড়ে। বাংলার রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী বাঁশফোড়, মালপাহাড়ী, মুণ্ডা সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীতে অদ্যাবধি সাবেকী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যই অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশের পূণ্যভূমিতে বসবাসকারী এই আদিম মানব বা বাংলার আদিবাসী, শতাব্দীর পর শতাব্দীর পরিণতিতে এসে কৌম সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, উৎস পর্বে এই আদিবাসীরা ছিল নিতান্তই বর্বর শ্রেণীর। জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের মাধ্যমেই পরবর্তীকালে তারা সভ্যতার আলোকময় পরিবেশের সাহচর্যে এসেছে। পরস্পর সম্পত্তি চেতনা এবং সহাব-স্থানের ভিত্তিই কৌম জীবন গড়ে লোক সমাজের গোড়া পত্তন

২। আদি-অস্ত্রালদের পূর্বে নিগ্রবটু গোষ্ঠীর বর্তমানতার কথা স্বীকার করা হয় কিন্তু বাংলার সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বে তাদের অবদানের কোন প্রমাণ না পাওয়ার জন্য অনুমান করা হয় কোন এক সময় তারা আদি-অস্ত্রালদের সঙ্গে মিশে গেছে।

৩। অনেকে আবার এদের ককেশীয় গোষ্ঠীর সঙ্গেও সংযুক্ত করে থাকেন।

করেছিল। আদি-অস্ত্রালরা বাংলার যে লৌকিক সমাজ-ব্যবস্হার পত্তন করে, তার মূল উপকরণ অষ্ট্রেলিয়ান ভূ-খণ্ডের আদিবাসীদের। এতে করে মনে হয়, অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী আদিম মানব গোষ্ঠীর কোন অংশ যে কারণেই হোক বিচ্ছিন্ন হয়ে এশিয়াটিক প্রি-হিষ্টোরীতে অস্ত্রাল বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্হানলাভ করে। বাংলার অস্ত্রাল সংস্কৃতির সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার সংস্কৃতির সাযুজ্য দেখে সে তথ্যের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

All Australian tribes without exception have remain hunters and gathers without evolving toward an agricultural civilization. Undeniably they were isolated from the rest of the world for thousands of years, but their totemistic beleifs were also largely responsible for their lack of evolution. According to these beliefs the responsibility for growth and increase in nature is entirely dependant on invisible spiritual forces ; if follows that man's intervention in natural processes by cultivating the soil is not merely superflous but is even a transgression against the universal order established by his ancestors and by mythical creators.[৪]

এ তথ্যানুসারে আমাদের দ্বিমত পোষণের কোনই কারণ নেই যে, বাংলার মানস সাংস্কৃতির নানা বিষয়ের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার মানব গোষ্ঠির ধারাবাহিকতা রয়েছে। এদের জীবন ও জীবিকা বাংলাদেশেও আকস্মিকভাবে হয়ে উঠে কৃষিভিত্তিক। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, অস্ত্রাল জাতীয় লোকেরাই (পূর্ব ও মধ্য ভারতে) প্রথম কৃষিকাজ ও তদবলম্বনে সংঘবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে। তাঁরা ধান, পান, কলা ও নারকেলের চাষ করত, পাহাড়ের গা কেটে ধানের ক্ষেত প্রস্তুত করত। প্রথমটা তাদের চাষ ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুমিয়াদের মত। লাঙ্গলের জন্য তীক্ষ্ণ মুখ কাষ্ঠদণ্ড ব্যবহার করত।[৫] শুধু এই নয়, এখানেও তাদের জীবিকার অন্য উপায় ছিল শিকার। নিষাদ ও শবররা পেশায় ছিল শিকারী। শিকার ছিল মুখ্যত দু'ধরণের—পশু ও মৎস।

৪। Encyclopedia of world Art, London ; Mc crow—Hill Publishing Company Ltd, Vol—11 P. 126.

৫। ধাতুর ব্যবহার জানা ছিলনা বলে।

শস্য ফলাবার ভূমি, খাল-বিল, নদ-নদী এবং অরণ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে কৌমের গ্রাম কেন্দ্রিক সমাজ জীবন। কৃষি ভিত্তিক গ্রাম-গুলিতে যুগপৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্পও গড়ে উঠে। কারণ তা ছিল কৃষি কাজের সহায়ক এবং কৃষি জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গৃহ শিল্পকে আবেষ্টন করে কৃষিযুগের প্রথম সামাজিক রূপ ও গঠন বধিত হতে শুরু করে। ব্যবহারিক জীবনে লোকজ সামগ্রী হিসেবে পরিচিত মুঠা, দড়ি, মই, জোয়াল দা, তাঁতরা, ধুরি বিষ, ফাল, ডিঙ্গি, কাছি, লগি দাঁড়, হাল, মাস্তুল, পাল, নোঙর, দোনা, কেড়ুয়াল, ঝুরি, চাঙ্গারী, চুপরি, কাঠা, ধামা, চালনা, কর্পট (পট বস্ত্র), কম্বল ইত্যাদি ঐ ধারারই ঐতিহ্যবহ।

একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত, ধাতবযুগের অস্ত্রালদের গ্রামীণ জীবনের পাশাপাশি বসবাস শুরু করে দ্রাবিড় জাতি। এরাও পেশা হিসেবে কৃষিই গ্রহণ করে কিন্তু এদের চাষাবাদ পদ্ধতি ছিল উন্নত-মানের। গ্রামের পরিবর্তে তারা পত্তন করে নগরের—সেখানেই শুরু করল বসবাস। কিন্তু উভয় জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে সমন্বয় ঘটেনি তা নয়। অস্ত্রালরা ধাতুর ব্যবহার এদের নিকট থেকে শিক্ষা করে এবং শিল্প ও সংস্কৃতিতে তার সংযোজন ঘটাতে শুরু করে।

অস্ত্রালদের শিকারজীবী অরণ্যচারী শাখা নিষাদ, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো প্রভৃতিরা ছিল পশু শিকারজীবী। শিকারে ধনুক, বাণ এবং পিণাকই ছিল প্রধান অস্ত্রোপকরণ। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন, 'চর্যাপদে' এবং মধ্যযুগের সাহিত্য 'চণ্ডীমঙ্গলে' শিকারজীবী-দের সুন্দর বর্ণনা আছে। এদের শিকার ছিল বিশেষ করে গজ, মাতঙ্গ, মেড়া, কাক, কর্কট এবং কপোত শ্রেণীর পাখী। কৃষি এবং শিকারের সঙ্গে এরা কিছু কিছু ব্যবসায় বাণিজ্যও করত। পূর্বোক্ত ডিঙ্গীও[৬] তারা এ কারণে ব্যবহার করত বলে মনে হয়।

৬। এদের ডিঙ্গীর নাম ছিল 'Canoe'

Canoes are made mostly of the bark of a large tree, a suitable piece being detached whole and in a form needing little manipulation, They often have out riggers and floats of light wood attache 'The Red Brown and Black Men of American and Australia London P—207

ধর্ম বিশ্বাস ছিল এদের অদ্ভুত। এরা বিশ্বাস করত একাধিক জীবনে। তাদের ধারণা ছিল কেউ মারা গেলে তার আত্মা কোন গাছ, পাহাড়, পশুপক্ষী বা অন্য কোন প্রাণীর রূপ পরিগ্রহ করে বেঁচে থাকে। এই মৃত্যু আত্মার প্রতি আস্থা, বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক পদ্ধতি এবং মন্ত্র, মানুষ ও প্রকৃতির সৃজনশক্তিকে মাতৃরূপে আরাধনা, টোটেমের ভক্তি ও সেবা, পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, নদী, বৃক্ষ, গ্রাম ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, ব্যাধি ও দুর্ঘটনা আনায়নকারী ভূতপ্রেত প্রভৃতি দুষ্ট শক্তিতে বিশ্বাস—অস্ত্রালদের মধ্যে প্রগাঢ়রূপে দানা বেধে ছিল। মৃতদেহকে তারা গাছের ছাল কিংবা কাপড়ে জড়িয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে বা মাটিতে পুঁতে ফেলত। মৃতকে অনেক সময় তারা খাবারও পরিবেশন করত। ধর্মীয় এ সব আচারানুষ্ঠানও অষ্ট্রেলিয়া থেকেই তাদের রপ্ত করা।

The mythical religious traditions of all Australian tribes, both past and present, revolve around supernatural figures, prevailingly in the form of men or wild animals, that in the most remote organized the world it still today.৭

বাঙালীর ধর্ম ভাবনার বনদেবতা বা বৃক্ষদেবতার স্বীকৃতি এবং শস্যদেবতার পরিকল্পনাও এ ভাবেই। এ দেশের বটগাছে 'ভরাই ডাকুণী' বা বুড়াঠাকরুণ' অধিষ্ঠান করে। ধান্যদেবতা এবং ক্ষেত্রপাল দেবতার পূজাও এদেরই প্রবর্তিত। পূজার উপকরণ এবং সমাজ সংস্কৃতির নানানুষ্ঠানে এখনও ধান, ধানের গুচ্ছ, কলা, দুর্বা, হলুদ, তণ্ডুল, তণ্ডুল-চূর্ণ, সুপুরি, নারকেল, পান, সিঁদুর, কলাগাছ ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে।

বাংলার লৌকিক সংস্কৃতিতে এগুলো অস্ত্রাল সংস্কৃতিরই অংশ। নানা উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে গায়ে হলুদ, পানখিলি, গুটি খেলা, ধান ও কড়ির স্ত্রী আচার, খই ছড়ান, লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপনা, ঘট ও ঘটের উপর আঁকা নানা প্রতীক চিত্র বাংলায় প্রচলিত রয়েছে। স্বজন বিয়োগের পর শ্রদ্ধাদিতে স্থাপিত তর্পন বৃষ কাষ্ঠের প্রচলন ও কৃষি,

---

৭। Encyclopedia of world Art: London; Mc Grow-Hill Publishing Company Ltd. Vol.—II P. 126

ঋতু, শস্য বিষয়কব্রত ও ব্রতালপনা।[৮] নবান্ন, শারদ ও বসন্তোৎসবের প্রচলন এ ভাবেই।

অষ্ট্রেলিয়ার মত, এখানেও তারা বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফলফুল, পশুপক্ষী, থান ইত্যাদির ওপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করত। বাংলার হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে তুলসী গাছ এবং পূর্বে আলোচিত বটগাছ এবং শ্যাওড়া গাছের প্রচলন রয়েছে।

বাংলার লৌকিক দেবতা মঙ্গল চণ্ডী প্রকারান্তরে বনদুর্গা। দেবতাকে মাতৃরূপে কল্পনা আদিম জাতি মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য হলেও অস্ত্রাল সংস্কৃতিই এর সূচনাকারী। তাই বাংলার অধিকাংশ লৌকিক দেবতাই মাতৃদেবতা। এর কারণ সমাজ বিজ্ঞানসূত্রে অবহিত হওয়া যায়—কৃষি ভিত্তিক সমাজ মাতৃতান্ত্রিকই হয়ে থাকে। বাংলার ধর্মীয় জীবনে তাই দেব অপেক্ষা প্রাধাণ্য বেশী দেবীর। প্রমাণ বর্তমান কালেও অনেক রয়েছে। বাংলার উত্তর এবং উত্তর পূর্ব সীমান্তবর্তী গারো এবং খাসিয়া জৈন্তা পর্বতে যে আদিম জাতি বসবাস করে, তারা এখনও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করতে পারেনি।

শক্তির প্রতীক চণ্ডী দেবী শক্তির অন্যতম উৎস হিসেবেই অস্ত্রাল সংস্কৃতিতে বিরাজমান। বর্তমান কালে ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওঁরাও উপজাতির 'চাণ্ডী' নামীয় শক্তি দেবীর পরিচয় দৃষ্টে তা স্পষ্টতর হয়। অস্ত্রালদের শক্তি দেবী চণ্ডী, বেশী অনুগৃহীত ছিল বিশেষতঃ ব্যাধ সম্প্রদায়ের কাছে। পশু কুলের এই অধিষ্ঠাত্রীদেবী ইচ্ছে করলেই পশু লুকিয়ে রাখতে পারে। কাজেই, শিকার করতে হলে তাকে খুশী করা প্রয়োজন। ওরাওঁদের এই দেবী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য আছে ঃ

Some of the sprits, however such as Chandi, the Goddess of hunting and war remarkable for shape shifting which is indeed a characteristic of the spirits and deities of the Oraon pantheon.

৮। অস্ত্রালদের ধারণা ছিল ব্রতের আল্পনা মূলতঃ অমঙ্গল নিবারণ করে ও ভূত প্রেতের দৃষ্টি থেকে বাড়ীর ছেলেমেয়েদেরকে রক্ষা করে।

৯। Oraon Religion and customs : Sarat Chandra Roy Ranchi 1928.

ওরাওঁদের চাণ্ডী পরবর্তীকালে দ্রাবিড় আর্য প্রভৃতি সমাজের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয়ে—পার্বতী, অন্নদা বা অন্নপূর্ণায় রূপান্তরিত হয়েছে। চাণ্ডী পূজার মত ধর্মপূজা ও অস্ত্রালদেরই প্রবর্তিত বলে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মত প্রকাশ করেছেন।[১০] তাঁর মতে, আর্য পূর্ব যুগের এমন কি প্রাক দ্রাবিড় পর্বে যে জাতি রাঢ় অঞ্চলে বসবাস করত, ধর্মপূজা মূলতঃ তাদের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়ে কাল-ক্রমে বৌদ্ধ এবং হিন্দু প্রভাবের সম্মুখীন হয়েছে। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় এবং ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মশায়ও একই মত পোষণ করেছেন। সুনীতি বাবু 'ধর্ম' শব্দটি অস্ত্রাল বলে দাবী করে দেখিয়েছেন 'ধর্ম' 'কূর্ম' বাচক প্রাচীন অষ্ট্রিক শব্দ।

ধর্মপূজার মত অস্ত্রালদের মধ্যেও চড়ক পূজার এবং হোলী বা হোলাক ধর্মানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। ধর্মপূজা এবং চড়ক পূজার ভিত্তি ছিল ভূতবাদ এবং পুনর্জন্মবাদ। হোলী অনুষ্ঠানরূপে স্বীকৃত হওয়ার আগে ছিল কৃষি সমাজের নৃত্য এবং গীতের অনুষ্ঠান। পূজা অর্চনা ও বিভিন্ন উৎসবাদিতে তারা ঢাক ঢোল ব্যবহার করত। কিন্তু বাদ্য যন্ত্র আরও অনেক ছিল। দেহবাদী অস্ত্রাল সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে হিন্দুতান্ত্রিক, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব, বাউল সম্প্রদায় নানা লোক বাদ্যযন্ত্র সৃষ্টি করেছিল পরবর্তীকালে।

অস্ত্রালদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা করা দেখা গেল, তাদের জীবন জীবিকা, ধর্মকর্মের ধ্যান ধারণাকে কেন্দ্র করেই বাংলার লৌকিক সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বৃহদাংশ গড়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রমাণ হিসেবে অস্ত্রাল কেন ? আমরা প্রাগার্য কোন জাতিরই সাবেকি নিদর্শন নমুনারূপে পাইনি। কারণ অনেকই আছে। সহজ ভঙ্গুর উপাদানের ব্যবহার হয়তো এর অন্যতম কারণ।

বাংলার গ্রামাঞ্চলের লোকশিল্পের প্রকৃতি থেকে এ কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো প্রাচীন শিল্পেরই অনুসৃত ধারা। বাংলার লৌকিক শিল্পকলার ইতিহাস অনুসরণে বলা যায় প্রাগার্য এবং অনার্য মুখ্যত অস্ত্রাল গোষ্ঠীর সমাজ ধর্ম, সভ্যতা সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে সে অবদান কিছুতেই উপেক্ষার নয়।

১০। বাংলার মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য কলকাতা

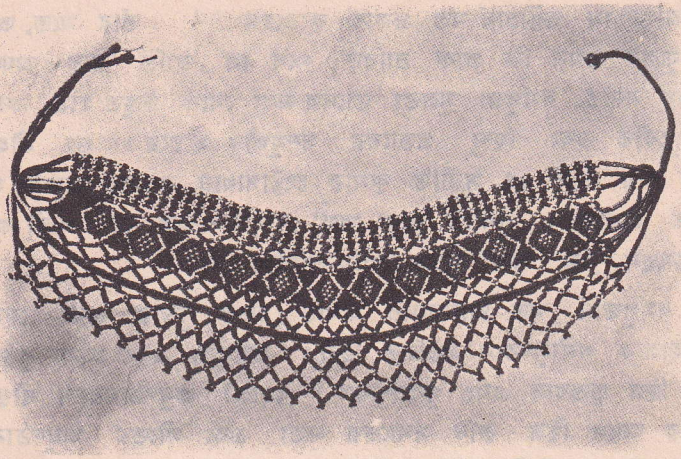

২। সাত-নরী হার।

৩। কাঠখোদাই, সিলেট।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ অঙ্কনে— এম, এ, কাইয়ুম